সংবাদ বিশ্লেষণ: একটি গণহত্যা সংঘটিত হতে যাচ্ছে

মায়ানমারকে বিচারের কাঠগরায় দাঁড় করাতে বিশ্ব এখনো জাগেনি

মূল রচনা: ইনাম আহমেদ ও শাখওয়াত লিটন
প্রকাশ: ডেইলি স্টার,২৫ নভেম্বর, ২০১৬
ভাবানুবাদ: মো. মজিবুল হক মনির, কোস্ট ট্রাস্ট

দুইটি ছবি অনেক দিন আমাদের স্মৃতিতে ভাসবে, সম্ভবত চিরদিনই মনে থাকবে।
একটি ছবিতে, সম্ভবত সন্ধ্যার দিকে তোলা, একটি পুরো গ্রাম জ্বলছে, বাতাসে উড়ছে আগুনের শিখা। বাঁশের বিচ্ছিন্ন কাঠামোগুলো এদিক ওদিক পড়ে আছে।

ছবিতে দেখা যায় কিছু নারী ও শিশু দৌড়াচ্ছে, কিছু বয়স্ক পুরুষও দৌড়াচ্ছে। তাদের পিছনে ছুরি হাতে কিছু পুরুষ দৌড়ে আসছে, তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ছবিটি মায়ানমারের ছিল, সম্ভবত ২০১২ সালে তোলা।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেকটি ছবি পরে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমেও স্থান করে নেয়। নৌকায় দাঁড়িয়ে থাকা এক রোহিঙ্গা পুরুষ করজোড়ে মিনতি করছে, হত্যাকারী মায়ানমার সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে বাঁচতে তাঁকে তীরে আসার অনুমতির জন্য কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করছে। পিছনে তাঁর সন্তানেরা জগতের সমস্ত অনিশ্চয়তা নিয়ে বসে আছে।

তারা কি নিরাপদ স্থানে ঢুকতে পেরেছিলেন? নাকি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? তারা এখন কোথায়? তারা কি বেঁচে ছিল? তাদের খবর কেউ রাখে না।

একই জিনিসের আবারও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। একই মায়ানমার সেনাবাহিনী ও একই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা আবার আমাদের সময়ের 'সর্বাধিক নিপীড়িত' লোকদের গলা কাটছে। এই গণহত্যার প্রতি বিশ্ব আশ্চর্যজনকভাবে চোখ বন্ধ করে আছে। এটাকে আমরা গণহত্যা বলছি, কারণ ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ গণহত্যার যে কয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে, তার সব কয়টিই মায়ানমার সরকার এখন করছে। ভয়ের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য গণহত্যার এসব বিষয় মায়ানমার প্রচার মাধ্যমের কাছ থেকে আড়াল করে রাখছে।

আশ্চর্যজনকভাবে, মায়ানমারের তথাকথিত মহান নেতা, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চির কাছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর পরিচালিত এই গণহত্যা বন্ধ করার জন্য একটি শব্দও ব্যয় করার সময় নাই। শুধু তাই নয়, তিনি রোহিঙ্গাদেরকে বাঙ্গালী হিসেবে অভিহিত করে এই গণহত্যার ঘটনাকে বৈধতা দিতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায় প্রকৃত তথ্য না জেনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি গোষ্ঠীর দিকে বেশি পক্ষপাতিত্ব করায় তিনি তাঁর হতাশাও প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি দাবি করছেন যে তার দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি 'আইন শাসনের' উপর ভিত্তি করেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে।

এই আইনের শাসনটা আসলে কী? মায়ানমার তাদের রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করতে চায় না। তাদের ভোটের কোনো অধিকার নেই। তাদের বিচরণ ছোট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তাদেরকে তাদের নিজস্ব এলাকার বাইরে অন্য কোন স্থানে যেতে অনুমতি দেওয়া হয় না। তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অধিকারকেও মায়ানমার সরকার স্বীকার করে না।

নাগরিকত্ব পেতে হলে তাদেরকে মায়ানমারে কমপক্ষে ৬০ বছর বসবাসের প্রমাণ দেখাতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই দরিদ্র, অশিক্ষিত লোকদের কাছে মায়ানমারে একদিন থাকারও কোনও প্রমাণাদি নেই, যদিও তারা সেই মুঘল আমল থেকেই দেশটিতে বসবাস করে আসছে।

বিষয়গুলোর সঙ্গে নাৎসী জার্মানির মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? এগুলো কি জাতিগত নিধন বা গণহত্যা শুরুর বৈশিষ্ট নয়?

ঠিক এটাই ঘটেছে পরে। প্রথমে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশী এই অভিযোগে ১৯৯০ সালে, এবং তারপর আবার, বারবার। ২০১৩ সালে রোহিঙ্গা পুরুষ কর্তৃক এক মায়ানমার নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়, এর পরপরই আরও একবার রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু হয়।

আর এবার, ৯ অক্টোবর, কিছু জঙ্গি কর্তৃক ৯ জন পুলিশ হত্যার অভিযোগের পর অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে, আগপাশ না ভেবেই রোহিঙ্গাদের হত্যা ও ধর্ষণ করা শুরু হয়ে যায়। কারা এই পুলিশ হত্যার সঙ্গে জড়িত তা খুঁজে বের করতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করতেও সময় হয়নি মায়ানমার কর্তৃপক্ষের।

এই পর্যন্ত প্রাপ্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে, গণহত্যা এবং নারী ধর্ষণ হচ্ছিল সরকারি নির্দেশেই। একটি সমগ্র জাতিগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, যা কিনা একটি গণহত্যা।

এতকিছুর পরেও, বিশ্ব প্রতিক্রিয়া অদ্ভুতভাবে ক্ষীণ। জাতিসংঘ একটি বিবৃতি দিয়েছে, যাতে মায়ানমারকে তার অন্যায়ের জন্য কঠোরভাবে দোষারোপ না করে, অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করতে দেশটির প্রতি আহ্বান না জানিয়ে, বরং সেই বিবৃতিতে বাংলাদেশকে তার সীমান্ত খুলতে বলেছে। মৃদু স্বরে, এই বিবৃতিতে মায়ানমারকে ‘আইনের শাসন’ অনুযায়ী তার নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিল।

মানবাধিকার কর্মীদেরকে সে দেশে প্রবেশ করতে দিতে জাতিসংঘ মায়ানমারের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিল, মায়ানমার তা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে। আর পশ্চিমা দেশগুলোর এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া কি ছিল? আমরা সে বিষয়ে কিছুই জানি না। পশ্চিমা দেশগুলো সম্ভবত মনে করেছে মায়ানমার গণহত্যা থেকে অনেক দূরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মায়ানমার সরকারের সঙ্গে কাজ করার কিছু সুযোগ পাওয়াতেই খুব খুশি। এই গণহত্যার যারা উদ্বাস্ত হবে, তারা যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের দিকে যাবে না, , তাই এতে দুশ্চিন্তার কী?

কিন্তু এরপরেও আমাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। এই বিশ্ব যদি মানবজাতিকে নিয়ে গর্ব করতে চায়, তাহলে কীটপতঙ্গের মতো মানুষ মেরে ফেলার এই ঘটনা বন্ধ করতে হবে।